ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর

তরুণ মুখোপাধ্যায়

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা সেই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"
('কাব্য ও ছন্দ'/রবীন্দ্রনাথ)

বাংলা কবিতার আদি-মধ্যযুগের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছন্দোবদ্ধ পদ্যই কবিরা ব্যবহার করেছেন। কেননা গদ্য মানেই বাস্তব ও প্রাত্যহিক কাজের ভাষা। কালান্তরে এই ধারণার অবসান ঘটেছে। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার' না-রেখেও 'বাংলা গদ্যে কবিতার রস' দেওয়া সম্ভব। তিনি এও দেখেছিলেন, "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে... একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা" আছে। সেখানে "অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।" কথাগুলি কবি 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় বলেছিলেন। তাঁর মতে, গদ্যকবিতা 'রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়।' গদ্যে তিনি অনুভব করেছেন 'নিয়মের শাসন নেই'। গদ্যছন্দ 'পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত'। তাই গদ্য কবিতার ছন্দকে তিনি 'ভাবচ্ছন্দ' নাম দিতে চান। বলেছেন—

> "...কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে।" ('গদ্যছন্দ')

প্রসঙ্গত 'ছন্দ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দাবি জানিয়েছেন, 'বাংলায় নূতন ছন্দ অনেক আমিই প্রবর্তিত করেছি' যার মধ্যে গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতা অন্যতম।

বিতর্কটা এখানেই। রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গদ্যকবিতা লিখেছেন; কিন্তু গদ্যকবিতার জনক তিনি নন। সচেতনভাবে গদ্য ও পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন যিনি প্রথম করেছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনাথের দাবির ঢের আগে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১-এ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন—

> "এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী।"

পরবর্তীকালে মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই কথা বলেছিলেন। যেমন, 'বাঁশি' কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই কবিতায় ভাববস্তু 'অন্য কোনো ছন্দেই চলত না, গদ্যছন্দ ছাড়া', কিংবা বলেন, 'গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্যকবিতাতেই যথার্থ সুন্দরভাবে প্রকাশ হতে পারে এমন কথাও আছে।' (দ্র. 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ')। ফিরে আসি বঙ্কিমচন্দ্রে। তাঁর নিজের দেওয়া 'তিনটি গদ্য কবিতা'— মেঘ, বৃষ্টি, খদ্যোত। নমুনা—

> *এসো কাঁদি— বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন?*
>
> ('খদ্যোত')

এই গদ্যকে পঙ্‌ক্তি ও পর্বে বিন্যস্ত করলে গদ্যকবিতার রিদ্‌ম পাওয়া যাবে।

এসো কাঁদি— বর্ষার সঙ্গে
তোমার আমার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ
কেন?

আলোকময় নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল
বসন্ত গগনে
আমার স্থান নাই
কেন?

গদ্যকবিতা হিসেবে এখানে পর্বসাম্য নেই, সুষমা আছে; অন্তর্লীন ছন্দও পাওয়া যায়। অথচ 'লিপিকা'য় রবীন্দ্রনাথ যে-গদ্যকবিতা লিখলেন, সেখানে পদ্যছন্দের স্পন্দন মুছতে পারেননি। যেমন, 'পায়ে চলার পথ'—

এই তো
পায়ে চলার পথ।
এসেছে
বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,
মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,
খোয়াঘাটের পাশে
বটগাছতলায়।

এখানে 'গদ্যকে কাব্য' করে তোলা হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে যেজন্য বলেছিলেন,

"...কবিতার পাঁচিল তিনিও (রবীন্দ্রনাথ) ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাঙ্‌ক্তেয় করেন।" ('জনসাধারণের রুচি')

এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'লিপিকা'-র রচনাগুলিতে 'গদ্যকবিতা' বলেননি। 'পুনশ্চ' পর্বে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল 'বাস্তব জগৎ আর রসের জগতের সমন্বয় সাধন'। যেমন,

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে, 'মানে কী'।
মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।
('কোমলগান্ধার')

কিংবা বিখ্যাত 'শিশুতীর্থ' কবিতা—

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধকাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।

প্রথমে কবি ইংরেজিতে লেখেন The Child (১৯৩১)। তার শুরুটা—

'What of the night'? they ask.
No answer comes.
For the blind time gropes in a mare
and knows
not its path or purpose.

'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন' এভাবেই তিনি এখানে ভেঙেছেন।

কীভাবে গদ্যকবিতাকে নির্মেদ করতে হয়, তা-ও দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯২৮) কবি রাণী মহলানবীশকে একটি চিঠি লেখেন—

"অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা।"

'শেষ সপ্তক' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটা পড়া যাক—

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।

ছন্দ আর গদ্য প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ যা বলেছেন তা স্মরণ করতে পারি।

"পাউন্ড ছন্দের একটা সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন এই বলে যে এ হলো 'a form cut into time'। গদ্যকে বলা যাক স্বতন্ত্র আর একটি বিন্যাস যা ভাবনা জগতের অন্তর্বর্তী দেশ-কে (inner space) রূপায়িত করে আনে।" ('আধুনিক ছন্দ')

ব্ল্যাংকভার্স ও ফ্রিভার্স মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথ যা রচনা করলেন, শঙ্খবাবুর মতে তা 'রবীন্দ্রিক গদ্যছন্দ'। কৌশলী বাক্‌স্পন্দ এনেও ম্যানারিজ্‌ম মুক্ত নয় তাঁর গদ্যকবিতা। একে 'গদ্যছন্দ' বলতে চান না ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁর মতে, 'গদ্যকবিতায় ছন্দ থাকে না, কিন্তু ছন্দের ভঙ্গিটুকু থাকে।' কবি ও ছান্দসিক উত্তম দাশের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে পুনরুদ্ধৃত করা যায়।

"গদ্যকবিতা ও গদ্য-ছন্দ প্রসঙ্গে অনেকে ফ্রিভার্স জাতীয় ফরাসী verse libérés এবং verse libres শব্দদুটির উল্লেখ করেন। verse libérés-কে বলা

হয়েছে free verse— পদ্যছন্দের মধ্যে গদ্যধর্মের মিশ্রণ। ফ্রান্সে প্রতীকবাদী আন্দোলন পর্বে পল ভেরলেন এই রীতির প্রবর্তক।...

"অন্যপক্ষে verse libres হলো খাঁটি গদ্যে লেখা কবিতা। পদ্যবন্ধের কোন অবকাশ নেই এখানে।... গদ্যের মধ্যে কবিতার স্পন্দন ফুটিয়ে তোলাই প্রধান কবিকৃত্য।" ('বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি')

এই অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথ যে-গদ্যকবিতা লিখলেন তাতে শঙ্খ ঘোষের অনুমান, "ছন্দকেই নমিত করে আনলেন কবি গদ্যের দিকে, নিয়ে এলেন তাকে অনায়াস বাক্‌স্পন্দে।" রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা নানাভাবে সেই গদ্যকবিতার চর্চা করে গেছেন। কখনো কবিতার স্তবকে, কখনো টানা গদ্যে। যে-কোনো কাব্যিকতা ও ছন্দের দোলা থেকে বাংলা গদ্যকবিতা মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্ববাক হয়ে উঠল।

অরাবীন্দ্রিক হওয়ার তাগিদে তিরিশের বা বিশ শতকের তিনের দশকের কবিরা যেমন তত্ত্বের খোঁজে ফ্রয়েড ও মার্ক্সের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তেমনই পাশ্চাত্যের কবিদের কবিতা ছিল তাঁদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। এইসব কবির মধ্যে হুইটম্যান, লরেন্স, বোদলের, এলিয়ট, ইয়েট্স ছিলেন অন্যতম। যাঁরা সমিল কবিতা লেখার লোভ পরিত্যাগ করেছিলেন। হুইটম্যান যেমন তাঁর আমেরিকার 'ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা' প্রকাশে 'বিস্তারিত গদ্যচরণ' নির্মাণ করেছিলেন, তেমনই সমর সেন 'ছন্দোহীন পরিহাস্য এই সামাজিকতাকে' ধরার জন্য মোহভাঙা গদ্যবন্ধে কবিতা লেখেন— এমনই বলেছেন শঙ্খ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্বে দেখেছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকায় নতুন কবির দল নিয়ম ভেঙে নব্যরীতির ও ভাবনার কবিতা লিখছেন। সেইসব কবির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন কবির প্রিয়। তাঁকে একাধিক চিঠিতে কবি 'আধুনিক' কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তরুণ কবিদের কবিতা পাঠে কবিগুরুর প্রতিক্রিয়া, এখনো কারো কারো কবিতায় 'গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টিবিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত' জড়িয়ে আছে। তবে অকপটে এও বলেন তিনি (বুদ্ধদেব বসুকে)—

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতাটিতে পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগল ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক!...সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে।" ('কবিতা'/দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪২)

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন (২২ মে, ১৯৩৫)—

"... রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য।... গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথই গদ্যকবিতা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। যদিও আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। বলা যায়, প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো। হুতোম প্যাঁচার নক্সা-য় কালীপ্রসন্ন সিংহ 'রথ' প্রকরণের শুরুতে মুক্তক ছন্দে গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে লেখেন—

হে সজ্জন! স্বভাবের
সুনির্মল পটে
রহস্যরসের রঙ্গে
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে।

রাজকৃষ্ণ রায় 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে' লেখেন,

থাক শুয়ে বিধুমুখি!
বিজয়-হৃদয়-পাখী!
সারা নিশি কষ্টভোগ—
আহা, কি রোগের জ্বালা!
জাগাব না— থাক শুয়ে—
জাগাইলে হবে পাপ। ('নিভৃত নিবাস')

গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ'-এ যা লেখেন, সেও গদ্যছন্দের পথ প্রশস্ত করেছিল মনে হয়। রাজকৃষ্ণ রায় যে 'পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক পদ্যগদ্য' লেখেন, তাকে তাঁর মনে হয় 'গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব' আনা। যেমন,

আকাশ নীল— অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু
অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ
অনন্ত নীল!

বাংলা ছন্দের পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন

তাঁদের কারো মতে, 'বাঙলায় পদ্যের মতো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে প্রথম গদ্যকবিতা লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।' (দ্র. রবীন্দ্রকাব্যপ্রসঙ্গ : গদ্যকবিতা/সুশীলকুমার গুপ্ত) 'বিজলী' পত্রিকার ১৩৩২ সনের ১৫ জ্যৈষ্ঠ 'পথ' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় গদ্যকবিতা 'পাঁওদল' বেরোয় ১ শ্রাবণ 'বিজলী'-তে।

এ জীবন ধরে এই পথটিতে যা কিছু দেখেছি,
শুনেছি, ভালবেসেছি,
সবের গান গাইব। ('পথ')

আরো পরে তিনি লেখেন 'নীলকণ্ঠ' কবিতা—

আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ায়!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্‌ণ তাই সভ্যতা।

এর পাশে গদ্যকবিতায় কখনো হপ্‌কিন্স, কখনো ই. কামিংসকে অনুসরণ করে অমিয় চক্রবর্তী লেখেন—

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝংকার
অবিরহ,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা ('বৃষ্টি')

কিংবা 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' কাব্যে পড়ি—

দিকে দিকে
উদ্ভিন্ন
বাজে অঙ্কুরে
অন্তিকে
বাজে দূরে
কঠোর অভিজ্ঞানে

সেখানে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যকবিতার সুষমা লিরিকের ছোঁয়া আনে—

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
('চিল্কায় সকাল')

বিষ্ণু দে লেখেন—

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায়?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী। ('পদধ্বনি')

সমর সেন গদ্যকবিতাই লিখেছেন।

বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা,
মাঝে মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি। ('নিরালা')

চল্লিশের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র গদ্যকবিতায় স্বচ্ছন্দ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতা সকলের জানা। স্বল্পজানা 'নরক' কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি। সত্তরের রক্তাক্ত ভয়ার্ত পরিবেশে লেখা এই কবিতা।

যত হত্যা তত জয়; যতবেশ্যালয়ে বেলেল্লার অশ্লীলদূষিত
রক্তে মুহুর্মুহু করতালি, তত উলুধ্বনি ঘরে ও বাহিরে;
নাচে নগরীর শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণ, নাচে মন্ত্রী, নাচে
বিরোধীদলের নেতা; নিষ্পাপ গর্ভের শিশু রক্তে ভাসে,
নাকি বেশ্যাদের গর্ভে জন্ম নেই,...

ফরাসি কবিতার অনুরাগী অরুণ মিত্র লেখেন টানা গদ্যে —

নিশুত রাত। আমি দুঃস্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেছি। মনে হচ্ছে যেন ভোর ফুটছে। কোথা থেকে আসছে এই আলো? ('অরুণোদয়ের পথে')

আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যকবিতায় পাই আলাপচারিতার ভঙ্গি—

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই। ('আমার কাব্য')

পঞ্চাশের কবিরা মুখের ভাষাকে কবিতায় আনতে চেয়েছেন। সাদামাটা আটপৌরে গদ্য তাঁদের কবিতার সম্পদ।

১. *সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,*
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম! (ছুটি/শঙ্খ ঘোষ)

২. *তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে*
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকা হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধূলি হলো।
(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

৩. *নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙ্গার মেঘলা আকাশ*
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস-ভরা হাসি
(উত্তরাধিকার/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৪. *আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে*
তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,
চিঠি লিখব না।
আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়।
(হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ/বিনয় মজুমদার)

৫. *এখানে একটা বাড়ি ছিল*
এখানে কোনো বাড়ি নেই।
চেঁচিয়ে বলি, বাড়ি তুমি কোন্‌খানে আছো।
(শোনো জবাফুল/আলোক সরকার)

ষাট বা ছয়ের দশকে হাংরি ও শ্রুতি আন্দোলন কবিতার ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছে। অ্যান্টি-পোয়েট্রি ভাবনাও এসেছে। যেমন, তুষার রায় লেখেন—

গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কিনা। ('দেখে নেবেন')

অন্যদিকে মলয় রায়চৌধুরীর বাগ্‌ভঙ্গি—

আমি কি করব কোথায় যাব ওফ্ কিছুই ভালো লাগছে না
সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে ধ্বংস করে যাবো।
('প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার')

কবিরুল ইসলাম সহজ সারল্যে লেখেন,

আমার পূজা শুধু শরৎকালে নয়
আমার পূজা প্রতিদিন ('প্রতিদিন')

ভাস্কর চক্রবর্তীর গদ্যে লিরিক ও কথনভঙ্গি মিশে যায় —

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকব
— প্রতি সন্ধ্যায়
কে যেন ইয়ার্কি করে, ব্যাঙের রক্ত
ঢুকিয়ে দেয় আমার শরীরে— আমি চুপ করে বসে থাকি।
('শীতকাল কবে আসবে')

পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘকবিতায় মহাকবিতার মেজাজ এনে গদ্যকবিতাকে আরেক মাত্রা দেন—

আমার দু'হাতে কুষ্ঠ, অক্ষমতা শয়তানের পঙ্গু প্রতিরূপ
চৈতন্যের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে সংখ্যাহীন মর্গের ইঁদুর।
('ইবলিশের আত্মদর্শন')

সত্তর-আশি-নব্বই এবং একুশ শতকের প্রথম দশক জুড়ে যেসব গদ্যকবিতা পশ্চিমবঙ্গে লেখা হচ্ছে, সেখানে কবিরা চাইছেন, কবিতা যেন নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বৈতরাগিণীতে বেজে ওঠে। মহিলা কবিদের মধ্যে দেবারতি মিত্র, কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী প্রমুখ সংসার ও সমাজের যে-ভাষ্য রচনা করছেন, সেখানে প্রতিবাদ ও প্রেম, কাম ও বেদনা গদ্যকবিতায় মূর্ত হয়েছে। তবে এটাও ঠিক, পূর্বজ কবিদের গদ্যকবিতা ও গদ্যছন্দকে তাঁরা আমূল বদলে দিয়েছেন এমন নয়। পুরুষকবিদের ক্ষেত্রেও সে-কথা সত্য।

উত্তর-পূর্ব ভারতে যাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি, যাতে তাঁদের রচনাভঙ্গি কেমন বোঝা যাবে।

১. *সপ্রাণ সফেন সব নরনারী কাপড়েরই মতো শুকনো মাড়ে*
খরখর করছে; নাও ইস্ত্রি করো, প্রাণ ঐ দু'তিন ভাঁজের
তেনা তেনা। (ক্রমশ ধোপানি আসে/বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত)

২. *কবির বুকের শব্দ পাঠকেরও বুক ছুঁয়ে থাকে*
তার মাঝে মায়াজাল তার মাঝে রহস্য পরিখা।
(কবি পাঠক সংবাদ/শক্তিপদ ব্রহ্মচারী)

৩. *বন্ধু আমি সুদীর্ঘকাল বাত্যাহত*
ছিন্নপালে পাগল হাওয়ার অট্টহাসি।
(বাত্যাহত/উদয়ন ঘোষ)

৪. *আমি তো তোমাকে দেখতে চেয়েছি/চাঁদের চোখে*
(রমানাথ ভট্টাচার্য)

বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর এভাবেই বহমান। ❑